সত্যজিতের শতবর্ষ
একশোয় ১০০

হিল্লোল দত্ত

ঐতিহ্য

যেসব কথা বইতে বলা হয়নি
৩

উৎসর্গ

মা, স্বপ্না রায়

ও

পাপাইয়ের মা, পূর্ণা রাহা

যারা ক্যান্সারের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে অকালে

এবং

প্রিয় অভিদা, ড. অভিজিৎ রায়,

যিনি ইসলামি মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে
প্রাণ হারিয়েছেন অকালে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লিমা ভট্টাচার্য
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
রোকন হোসেন
নীলাঞ্জনা অদিতি
গীতা দাস
অদিতি কবির খেয়া
ইলিয়াস কমল
আরিফুর রহমান নাইম
ফেসবুক ঢল : মলাট, বইয়ের হাট, Tintin Fans

সূচিপত্র

যেসব কথা বইতে বলা হয়নি ৯
যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে ১৫
এক দুই তিন ১৭
সম্পাদন, সংশোধন-এক ১৮
অ্যাকশন! ২০
চিরবিভাজন রেখা ২১
বাংলাদেশের হৃদয় হতে ২৩
তুমি কি কেবলি ছবি? ২৬
লক্ষ্মীর পাঁচালি ২৭
মাটিতে তারার মেলা ২৯
কল্পবিশ্বচারী ৩১
সম্পাদন, সংশোধন-দুই ৩৪
দাদাগিরি ৩৫
গুপ্ত সঙ্কেত ৩৭
চতুর রঙ্গ: চতুরঙ্গ ৩৯
ওথেলো সিন্ড্রোম ৪২
স্বপ্ন, রক্ত, মৃত্যু ৪৫
চরিত্রের সন্ধানে ৪৭
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ৪৯
শিবঠাকুরের আপন দেশে ৫১
দদামি তে দিব্যচক্ষুং ৫৩
দূরতর অশনিতর্জন ৫৫
নামমাত্র ৫৭
সোনার পাথরবাটি ৫৯
কমলপুরাণ ৬১
অমৃতে অরুচি ৬৪
শান্তিনিকেতন, সব হতে আপন ৬৬
শতরঞ্জ কে খিলাড়ি ৬৯
অন্তর্ঘাত ৭১
তুমি দ্যাখালে ভাই ৭৩

৭৫ অপরিচিতা
৭৭ যৌনতা নগ্নতা অশ্লীলতা
৮০ চিরসখা হে
৮২ সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে
৮৬ কাপুর এন্ড সন্স
৮৯ তেরে বিনা জিন্দগিসে কোই
৯১ কফিহাউসের সেই আড্ডাটা
৯৫ সমারূঢ়
৯৭ স্থিতপ্রজ্ঞ
৯৯ স্যাপিওসেক্সুয়াল
১০১ রসেবশে-এক
১০৩ গুপীর গুপ্তখাতা
১০৫ বসন্ত এসে গেছে
১০৭ ধরা দেবে না অধরা ছায়া
১০৯ হীরক রাজার দেশে
১১১ গয়নার বাক্স
১১৩ বিপদবিত্তান্ত
১১৫ রসেবশে-দুই
১১৭ দুই ভুবনে
১২০ পাখি আমার নীড়ের পাখি
১২২ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে
১২৬ আম আঁটির ভেঁপু
১২৮ রায়ভুবনে ও রায়ভবনে টিনটিন
১৩৫ কল্পবিজ্ঞানের গল্প
১৩৯ ডেঞ্জুপদ
১৪১ গোড়ায় গলদ
১৪৩ আকাশ কেন ডাকে
১৪৫ ওড়াউড়ির দিনগুলি
১৪৭ অতিথিদেবো ভবঃ

গুপীবাঘা-এক ডজন গপ্পো ১৪৯
সন্ধ্যা শশী বন্ধুটি ১৫২
স্বপ্ননগরী হলিউডে একদিন ১৫৪
জটায়ুর জটিল যন্ত্রণা ১৫৭
সুরসুন্দর ১৫৯
হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ১৬১
গুরু থেকে পকেটমার: অনন্য উত্তমকুমার ১৬৪
বাক্সবদল ১৬৭
লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প ১৭০
সন্ধ্যারাতের শেফালি ১৭২
ব্যবসাবান্ধব না বন্ধুবান্ধব? ১৭৫
পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে ১৭৭
গুপী গাইন বাঘা বাইন-আরো এক ডজন ১৮০
কান-এ মান ১৮৩
একটুকু ছোঁয়া লাগে ১৮৬
বঙ্গ বিখ্যাত তারকা ১৮৮
গল্প হলেও সত্যি ১৯১
পুনর্জন্ম ১৯৩
শ্রুতিধর ১৯৫
গ্রহান্তরের আগন্তুক ১৯৭
সবিনয় নিবেদন ২০১
২০৮ দান দান তিনদান
২১২ কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
২১৪ হারানো সুর
২১৮ সম্পাদক সত্যজিৎ
২২২ বসন্তলীলা
২২৫ প্রতিবাদ প্রতিরোধ
২২৮ প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ
২৩৪ নামপরিণাম
২৩৬ খেলায় খেলায়
২৩৯ দ্য আউটসাইডার
২৪৫ নামেও সইত্যজিৎ, কাজেও সইত্যজিৎ
২৪৭ খাই খাই
২৫০ সংসারে এক সন্ন্যাসী
২৫৩ মৃণালকণ্টক
২৫৯ শালবৃক্ষের মতন সিনা
২৬২ সিগনেট প্রেসের দিনগুলো
২৬৭ ছবির মানুষ
২৭০ অনীশ অনীক
২৭২ দুই বন্ধু
২৭৬ ম্যাজিক, ম্যাজিক!
২৭৮ দ্য ক্রিকেট কানেকশন
২৮২ তথ্যপঞ্জি

যেসব কথা বইতে বলা হয়নি

সময়টা ১৯৮৮ বা ১৯৮৯।

মা-বাবা কেনাকাটায় বেরিয়ে রাতের বেলা ফিরে হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটা বই। মলাটে একজন গুরুগম্ভীর, আকর্ষণীয় লোক। ডান হাতের তর্জনীটা সামনে তাক করা। একেই বলে শুটিং। নামটাও বেশ চমৎকার।

শুধু গল্পপড়ার আর গল্প ভালোলাগার বয়েস তখন। কিন্তু এই অগল্প বা গল্পের মতন বইটা আর ছবিগুলো মাথায় এমনভাবেই ঢুকে গেল যে আমিও তখন শুটিঙের ইউনিটের সাথে ঘুরে বেড়াই কলকাতার অলিগলিতে, স্বপ্নে দেখি সত্যজিৎকে আমি দেখছি, কথা বলছি, আর শিহরিত হই অসম্ভবরকমের।

সেই থেকেই শুরু।

এর আগেও তাঁর দুচারটে লেখা বা বই পড়েছি। প্রথম পড়েছি সম্ভবত ছিন্নমস্তার অভিশাপ, নওরোজি সংস্করণে। তখনো সেটার রস পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এই শুটিঙের গল্পের বইটা দিয়েই সত্যজিৎ আমার স্বপ্নপুরুষ হয়ে উঠলেন।

এরপর তাঁর লেখা যেখানেই পেয়েছি, পড়েছি। বা গোগ্রাসে গিলেছি। তাঁর অলঙ্করণের রেখায় বিস্মিত ও আপ্লুত হয়েছি। কিন্তু তখনো তাঁর আসল শক্তি, তাঁর চলচ্চিত্রের দিকে যাওয়া হয়নি। এরপর প্রথম যৌবনে যখন যুক্ত হলাম চলচ্চিত্র সংসদের আন্দোলনের সাথে, তখন তাঁর সাথে পরিচয় হলো নিবিড়তর। কিন্তু তার আগে বলতেই হয় সানন্দায় ধারাবাহিকভাবে পাঁচালী থেকে অস্কার পড়ার কথা। সেই লেখালেখিই আমার মূলত চোখ খুলে দেয় চলচ্চিত্র দেখাবোঝা নিয়ে এবং সত্যজিতের চলচ্চিত্রের ভাষা ও রূপরস নিয়ে।

তবে এতশত বোঝার আগেও পথের পাঁচালী দেখার যে-মোহময় অনুভূতি, তা ছিল অলৌকিকতায় সুমধুর। আর হীরক রাজার দেশে-র রাজনৈতিক মর্মবস্তু আমাদের হাসির মধ্যেও ভাবতে শিখিয়েছিল।

এর মধ্যে পড়ছি এন্ড্রু রবিনসনের দ্য ইনার আই, যার কিছুটা অনুবাদ শুরু করেও গেছি থেমে। সত্যজিতের আওয়ার ফিল্মজ, দেয়ার ফিল্মজ থেকে অনুবাদের হাতেখড়ি হয়েছে, হাত মকশো করেছি স্থানীয় দৈনিকের পাতায়। নিজের নাম পত্রিকায় দেখার আনন্দটা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ বয়েসে অলৌকিক ছিল বৈকি।

শতবর্ষ যখন এসেই পড়ল, তখন প্রথমত মনেই পড়েনি। যখন পড়ল, তাঁর জন্মদিনে দিনভর খেটেখুটে এক ডজন গপ্পো নামিয়ে দিলাম ফেসবুকে। হাজেরানে মজলিসের কাছে প্রশ্ন রাখলাম, এরকম শখানেক কাহিনি নিয়ে বই করলে তাঁরা নেবেন কিনা। তাঁদের অনেকের সোল্লাস সোৎসাহ সমর্থন আমায় সাহস যুগিয়েছে, দিয়েছে শক্তি।

এরপর তথ্যসংগ্রহের পালা।

তখন করালকোভিডকাল। ঘুরেফিরে এদিকেওদিকে দেখেশুনে বই কেনার সময়সুযোগ ছিল না। চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সমৃদ্ধ গ্রন্থসমাবেশ বা এর পরিচালক প্রিয়তর শৈবাল চৌধূরীর সাথে দেখা করাটাও হয়ে ওঠেনি। দেখা হয়নি চট্টগ্রামের স্বনামধন্য সত্যজিৎগবেষক আনোয়ার হোসেন পিন্টুর সাথেও। তাই শেষতক আপনা হাত জগন্নাথ এটা মেনে নিয়েছি। নিজে যা পেয়েছি, তা থেকে জড়ো করার চেষ্টা করেছি আপ্রাণ। নিজস্ব সংগ্রহ, অনলাইনের সঞ্চয় এসব মিলিয়েই মূলত আমার এই বইটির কলেবর গঠিত।

বইটাতে আমি খুব বেশি জটিল, গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে যাইনি। তপন রায়চৌধুরীর মত আমারো কঠিন জিনিসে মাথা ধরে। আমি যেমনটা পছন্দ করি, তেমনই সহজসরল গল্প, কাহিনি, এবং প্রসঙ্গক্রমে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিংবা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্স আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কিনা, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কিনা, ডাইনিঙরুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরি কাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সাহেবি কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজি স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলি কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালি কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাইলেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?'

আমিও তেমনিই শিল্পী সত্যজিৎ, গুরু সত্যজিৎ, স্রষ্টা সত্যজিতের পাশাপাশি লঘুচালে সত্যজিতের জীবনের নানা দিকে কিছুটা আলো ফেলার চেষ্টা করেছি। এবং সেটা করতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছি তিনি কত যে বহুমাত্রিক, বহুকৌণিক মানিক, সর্বার্থেই।

হেলায়ফেলায় তিনি গল্প লেখেন, অনায়াসে তিনি অলঙ্করণ করেন, খেলাচ্ছলে অনুবাদ করেন, হেসেখেলে ছড়া লেখেন।

এবং এসব সৃষ্টির কোনোটির দিকেই বিশেষ মায়া নেই তাঁর। আজও তাঁর এরকম অজস্র সৃষ্টি সংকলনের অপেক্ষায় পড়ে আছে পুরনো সন্দেশ বা অন্য কোনো ছাপা কাগজের পাতায় বা অন্য কোথাও।

তাই তাঁকে ধরতে যাওয়া মানে কালিদাস রঘুবংশ লিখতে গিয়ে মুখবন্ধে যা বলেছিলেন, সেরকম বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার দশা হয়, আক্ষরিকার্থেই। তারপরেও শুধু নিজের মনের তাগিদ থেকেই কাজটা করেছি। কারণ কাজটা করে আমি তুমুল, তীব্র আনন্দ পেয়েছি। যতই ঘাঁটাঘাঁটি করি, ততই মজে যাই। যতই খুঁজতে থাকি, ততই অজানা খনির নতুন মানিক বেরুতে থাকে। এবং সেসব কৌতূহলী পাঠকদের সাথে ভাগাভাগির আনন্দটাও নেহাৎ ফেলনা নয়। ফেসবুকে দুচারটে দেই। মানুষের আগ্রহ দেখে বড় ভালো লাগে। নিজের ভুলত্রুটিও বুঝতে পারি। এমনি করেই বইয়ের সঞ্চয় বাড়তে থাকে একটু একটু করে। একশোটা কথা ও কাহিনিতে সত্যজিতের নানা দিক সন্ধান করেও দেখি, শেষ হয়নি সব। এমনই দীর্ঘ তিনি।

তবে সচেতনভাবে একটা জিনিস আমি করার চেষ্টা করেছি।

সত্যজিৎ বড়মাপের শিল্পী, বড়মাপের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব, বড়মাপের ভদ্রলোক, কিন্তু দিনশেষে তিনি দেবতা নন, সবার ওপরে তিনি যে-রক্তমাংসের মানুষ, সেটাই আমি দেখাতে চেয়েছি। মূর্তি বা ভাবমূর্তিপুজোর কোনোটিই আমার অন্বিষ্ট বা পছন্দের নয়। তাই কেউ কেউ হয়তো কিছু অংশ অগ্রহণযোগ্য ভাবতে পারেন। আমি শুধু বিনীতভাবে জানাব, পৃথিবীতে কোনোকিছু বা কেউই নেই যাঁদের নিয়ে খোলামেলা কথা বলা যায় না, যাবে না। মুক্তমতের স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দিতে ভাইবন্ধুদের কম তো দেখিনি। তাই এর সাথে আপোস আমার ঠিক পোষায় না। সমালোচনা মানতে পারি, কণ্ঠরোধ পারি না।

বইয়ের কাজে পুরনো লেখালেখি পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করেছি যে ইতিহাস মাঝেমধ্যে একটুআধটু বদলে যায়। এমনকি খোদ সত্যজিতের লেখা বা কথাও সব জায়গায় একরকম থাকেনি। একটা উদাহরণ দেই।

'একেই বলে শুটিং' বইতে তিনি লিখছেন শুণ্ডীর রাজার যুদ্ধযাত্রার গানের অংশে অন্তত হাজারখানেক উট ছিল। তাদের চালকদের জন্যে তিনি দিল্লি থেকে হাজারখানেক রঙচঙে পোশাক তৈরি করে এনেছিলেন। আবার আরেক সাক্ষাৎকারে বলছেন, উটের সংখ্যা হবে শতিনেক। অন্তত হাজারখানেক হলে ভালো হত। তাঁর ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়ও জানাচ্ছেন উটের সংখ্যা দুতিনশই। এবার বলুন, কোনটা ধরব?

বিজয়া রায় দিনলিপি লিখতেন। এবং সেখান থেকেই তাঁর বই 'আমাদের কথা।' দুহাতে সেই বই থেকে নিয়েছি আমার বইতে। কিন্তু সেখানেও তাঁর প্রদত্ত তথ্য বা উদ্ধৃতি সবখানে ঠিক বলে মনে হয়নি। পথের পাঁচালীর শুটিঙের শুরুর সন হিসেবে তিনি বলছেন ১৯৫১, তারিখও তাঁর জন্মদিন, অথচ সেটা ১৯৫২ হিসেবেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। সত্যজিতের মাই ইয়ার্স উইদ অপু বইয়ের প্রথম লাইনেই তথ্যটি

রয়েছে। কিন্তু সত্যজিতের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনিগুলো সত্যি বলেই বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছি। এরকম কিছু বৈষম্য আমায় বিব্রত করেছে। যেহেতু আমি পরোক্ষ সূত্রই ব্যবহার করেছি, তাই পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। তবে যথাসম্ভব যথাযথ তথ্যই রাখার চেষ্টা করেছি।

লোভের কারণেও কিছু ভুলভাল হওয়া সম্ভব। চলচ্চিত্তচঞ্চরীর ভবদুলাল উঁকি দিয়ে গেছে মাঝেসাঝেই। কী রাখব আর কী রাখব না, সেটা ঠিক করাও বেশ কষ্টের ছিল। মানিকের অঙ্গহানি করতে কি ইচ্ছে যায়? প্রতিটা টুকরোই যে ঝলকাচ্ছে তুমুল।

লেখাগুলো ঠিক যে কোন ধারায় পড়বে, সেটা নিয়ে কিছু বলা মুশকিল। এগুলো ঠিক প্রবন্ধ নয়, গবেষণা নয়, স্মৃতিচারণ নয়, রম্যরচনা নয়, এককথায় বলতে গেলে ব্যক্তিগত রচনা বলা যায় এসব, যা আকারে অনেকটা বড়সড় বা মাঝারি ফেসবুক পোস্ট বা সংবাদপত্রের নিবন্ধের মতন। তবে গঠনের এই ধারাটা মাথায় আসে, সরাসরি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো, উরুগুয়ের লেখক মহাত্মা এদুয়ার্দো গ্যালেয়ানোর বই থেকে। তিনি এরকম যেকোনো বিষয়ে টুকরো টুকরো পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতেন, প্রায়শই সংক্ষিপ্ত এবং ধারালো ভঙ্গিতে। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য সুস্পষ্টভাবেই ছাপ ফেলেছে তাঁর এসব লেখালেখিতে। আমি তাঁর কাব্যিক বা নিগূঢ় শৈলিটি ব্যবহার করিনি, কিন্তু তিনি যে এসবের পেছনে ছিলেন, সেটা জানানোটা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে কর্তব্য মনে করছি। তাঁর পাঠকেরা তফাতটা বেশ বুঝবেন।

তবে চেয়েছি ভঙ্গিতে না-হোক, অন্তত বিষয়ে নতুন কিছু আসুক, যেন গবেষকেরাও চমকান। সময়ই বলবে আমি নতুনতর কিছু উপহার দিতে পেরেছি নাকি স্রেফ চর্বিতচর্বণই করে গেছি। নানা সত্যজিতের মালা গাঁথতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর পরিবার বা সঙ্গীসাথীর কথাও উঠে এসেছে যাঁদের আমি সত্যজিতের মানসগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করি। সব মিলিয়ে এটুকু আত্মবিশ্বাস রেখে বলতে চাই, বইটা পড়লে সময়টা একেবারে বৃথা যাবে না, সম্ভবত।

লেখাগুলোয় ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছি যেগুলো হয়তো সবার কাছে সুবোধ্য নাও হতে পারে, যেমন কন্টিনিউইটি, শুটিং ইউনিট, সিকোয়েন্স। সেসবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি পাঠক সেসব নিজ থেকে খুঁজে নেবেন, এই প্রত্যাশায়। সত্যজিৎকে জানতে গেলে চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকের দুচারটে জিনিস জানলে নেহাত মন্দ হবে না বলেই ভেবেছি।

বইয়ের বানান যথাসম্ভব বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। আর গ্রন্থপঞ্জি যথাসম্ভব এপিএ রীতি অনুসৃত করে। মুদ্রণক্রটি কিছু থাকলে মার্জনার বিপুল অনুরোধ রইল। তথ্যের ব্যাপারেও একই কথা। ভুল যদি কিছু থাকেও, তা ইচ্ছাকৃত নয়। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে (যদি পাঠক বদান্য হন) সেসব শুধরে নেওয়া যাবে।

তবে যে-দুঃখটা থেকে যায় সেটা হলো সত্যজিৎ জীবদ্দশায় আবিশ্ব যে এত খ্যাতি পেয়েছেন বা এখনো পাচ্ছেন, সে-তুলনায় তাঁকে নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা খুব বেশি হয়নি। বাংলায় তো বটেই, বিদেশেও। তাঁর খ্যাতির তুলনায় তাঁকে নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ, লেখালেখি, বিচার যেন কমই। তাঁর পরিচালক পরিচয় তো বটেই, এছাড়া বাকিগুলো নিয়েও ভিনভাষায় আরো কাজ হওয়া উচিত ছিল।

তাঁর প্রতিভার আলোকদীপ্তি ছড়াতে বাঙালিদেরই আরো সচেতন হওয়া জরুরি। অন্য ভাষায় পারদর্শী বাঙালি তো কম নেই। শতবর্ষে সত্যজিতের বৈশ্বিক যে-পরিচিতি প্রাপ্য ছিল, আমরা কি তা দিতে পেরেছি?

বইটা লিখতে গিয়ে অনেকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি। ছোটোবোন নীলাঞ্জনা অদিতি নতুন প্রকাশিত বই থেকে সূত্র সংগ্রহ করে দিয়েছে, ফেসবুকের বন্ধু রোকন হোসেন কক্সবাজার থেকে ছুটে এসেছেন দুটো বই হাতে তুলে দিতে, অদিতি কবির খেয়াদির সাথে কথা হয়েছে এটাওটাসেটা নিয়ে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেলগীর অকৃপণ সাধুবাদে বিব্রত করেছেন বইপ্রকাশের সংবাদে, গীতাদি নতুন পড়া বইয়ের খবর জানিয়েছেন যদি কাজে আসে, অনুজতুল্য অনেকেই বই নিয়ে বেরুনোর আগেই উচ্ছ্বাস জানিয়ে আশান্বিত ও আশঙ্কিত করেছে, এবং আরো অনেকেই কৃতজ্ঞ করেছেন নিয়ত।

এছাড়া, ফেসবুক বন্ধু কবি ইলিয়াস কামাল যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন ঐতিহ্য-এর সাথে এবং ঐতিহ্যের প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইমও রাজি হয়েছেন বইটা প্রকাশে। এদুজনকে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সত্যজিতের সৃষ্টিজাদুঘরের কিউরেটর শ্রীমান দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বা ডেমু-র সাথে পরিচয়, যাঁর পেছনে রাজীব চক্রবর্তী নামের বড়ভাই আছেন, আমার জীবনের বড় পাওয়ার অন্যতম। ডেমু আমার লেখার কিছু অংশ তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে সংশোধন করে দিয়েছেন, যা বইটির শুদ্ধতা বাড়াতে অমূল্য অবদান রেখেছে।

সঙ্গী শ্রীমতি লিমা ভট্টাচার্যের কথা আলাদা করে বলতে হয়। নতুন কোনো অংশ লেখা হলে মাঝেমধ্যে তাকে পড়ে শুনিয়েছি। কখনো শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলেছি, এই লেখা কি লোকে পড়বে? তখন সে নিঃসংশয় অভয়বাণী জানিয়ে আশ্বস্ত করেছে। ইতিবাচকতার দিকে সে আমায় দুহাতে ঠেলেছে। বাড়তি কৃতজ্ঞতার বোঝা আর চাপিয়ে লাভ কী? বাকিটা তো ব্যক্তিগতই।

আর শ্রীমান হর্ষিল দত্ত বুবাইকেও ধন্যবাদ দিতে হয় একারণে যে সে না-থাকলে বইটা আরো আগেই শেষ হত। আমার ল্যাপটপের অজস্র সমস্যার পেছনে, যার কারণে আমার লেখালেখি অনেকবারই থেমে গেছে, তার অত্যাচার বড় ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও তার উৎপাতের কথা বলতে গেলে আরেকটি বইই লিখতে হবে। সে ঘুমুলে অবশ্য ব্যাপারটা খুব সুন্দর হয়।

শেষ করি যথারীতি আরেকটা গল্প দিয়েই, তবে সত্যি এটাও।

কলকাতা বইমেলায় আনন্দ পাবলিশার্স স্টল দিয়েছে।

সেখানটায় এক ভদ্রলোক এসে প্রথমে সেরা সত্যজিৎ চাইলেন যেটা সত্যজিতের নানান লেখার সঞ্চয়ন। নিয়ে সেটা বগলে পুরে বললেন, এবার এখানে যা আছে, সেটা বাদে বাকি সত্যজিৎ সব দিন।

কী মুশকিল!

সেরা সত্যজিৎ, পাঠকেরা জানেন, সব লেখার পূর্ণাঙ্গ সংকলন নয়। সত্যজিতের কোনো কোনো বই থেকে দুচারটে গল্প, ছড়ার বই থেকে গুটিকয় ছড়া, ছড়ানোছিটনো প্রবন্ধ এভাবে নিয়ে বইটা সাজানো। এমনকি বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিলেও তো সমস্যার সমাধান হয় না।

কাউন্টারের এদিকে ভ্যাবাচ্যাকা বিক্রয়কর্মীরা, ওদিকে অসহিষ্ণু ক্রেতা। বাদল বসু, আনন্দবাজারের প্রকাশক, জানাচ্ছেন, ভদ্রলোক বলেই চলেছেন অধৈর্য কণ্ঠে, কী হলো, দিন ভাই, দিন!

সত্যজিতের জন্যে আপামর বাঙালির এই চাওয়াও কখনো ফুরুবে না, এই আশায় আমার সত্যজিৎসন্ধানের ফলাফল পাঠকদের হাতে অর্পণ করলাম। আমার প্রথম বইটা দেখলে যাঁরা খুব খুশি হতেন, তাঁদের কেউ কেউ আজ দূর গগনের ছায়ায়। তাঁদের ভালোবাসার সাথে ভেজা চোখে স্মরণ করি।

বইটার ভুলত্রুটি, অপূর্ণতা, অসংলগ্নতার দায়ভার সব আমার, আর সৌন্দর্যের, পূর্ণতার, মুগ্ধকরার কৃতিত্ব সত্যজিৎ, তাঁর সঙ্গীদের ও তাঁর শিল্পকর্মের।

শতবর্ষে শত মানিক ছড়িয়ে পড়ুক দিকেদিগন্তরে।

যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে

সত্যজিতের গোপন একাধিক দিক ছিল অন্য সব মানুষের মতনই। তার মধ্যে একটা বেশ চমকপ্রদ। তাঁর ওপর লেখা সুখ্যাত বই দ্য ইনার আই (২০০৩)-এর লেখক এন্ড্রু রবিনসন বইটির মুখবন্ধে জানিয়েছেন সত্যজিতের এই ঘটনাটি। সত্যজিৎ মাঝেমধ্যে কলকাতা থেকে উধাও হয়ে যেতেন। যেতেন তিনি কাঠমান্ডুতে যেখানে তাঁকে কম লোকই চিনতেন। কেন যেতেন সেখানে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে?

সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ!

তিনি সেখানে যেতেন ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলতে। প্রাণ খুলে।

সন্দীপ রায় এন্ড্রু রবিনসনকে দেঁতো হাসি হেসে জানিয়েছিলেন তাঁর পিতাশ্রী একটি 'স্লট মেশিন ফ্রিক'। সন্দীপ দূরদর্শনে সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস করার সময় কিসসা কাঠমাণ্ডু কা টেলিফিল্মের শুটিঙে একবার যখন কাঠমান্ডুতে ছিলেন তখন তাঁর বিশ্বখ্যাত পিতৃদেব ক্যাসিনোতে কাঁচা পয়া ওড়াচ্ছিলেন।

বিজয়া রায় এর শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন এক জায়গায়, তাঁর আত্মজীবনীমূলক আমাদের কথা বইতে।

সীমাবদ্ধ (১৯৭১) ছবিতে রেসিঙের একটা সিকোয়েন্স আছে, তাই নিজের চোখে পুরো জিনিসটা সত্যজিৎ দেখে নিতে চান। সবাই মিলে জায়গা দেখতে গেছেন ঘোড়দৌড়ের ময়দানে। আসা উপলক্ষে সবাই মিলে রেস খেললেন। সত্যজিৎ বেশ উৎসাহ নিয়েই খেলেছিলেন। বিজয়া জানান, 'প্রথম দিকে আমরা দুজনেই অল্প জিতেছিলাম; লক্ষ করলাম, ওঁর চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। বুঝতে পারলাম, গ্যাম্বলিংটা ওর বেশ পছন্দ।' গুঞ্জন আছে, সত্যজিৎ সীমাবদ্ধ ছবির শুটিঙের সময় আরো কবার বাজি ধরেছিলেন।

কাঠমান্ডুতে তিনি বিজয়া রায়ের সাথেও যেতেন। বেশ কবারই গেছেন। সন্দীপ যেমনটা বলেছিলেন, স্লট মেশিনটাই তাঁর সবচে প্রিয় ছিল। বিজয়া, সন্দীপও খেলতেন, কিন্তু সত্যজিতের মতন নয়। টাকাপয়সা জীবনভরই চেয়ে

নিয়েছেন বিজয়ার কাছ থেকে। তাঁরা যেতেন বাজার করতে, তিনি যেতেন ক্যাসিনোয়। সেই ক্যাসিনো ছিল তাঁদের হোটেলের ঠিক নিচেই।

হেরেই ফিরতেন বেশিরভাগ দিন, এক-আধ দিন জিতলে মহাখুশি হয়ে উঠতেন বাচ্চাদের মতন। এমনকি একবার জন্মদিনেও কাঠমান্ডুতে প্রেমসে টাকা উড়িয়েছেন স্লট মেশিনে। বিদেশ যাওয়ার কথা উঠলেই শেষদিকে, মানে বাইপাস অপারেশনের পরে, যেতে চাইতেন কাঠমান্ডুতে, ছুতোনাতা ধরে। কিন্তু এত প্রিয় কাঠমান্ডুতেও শেষবার গিয়ে শারীরিক দৌর্বল্যের জন্যে আর স্লট মেশিনে খেলে স্বাচ্ছন্দ্য পাননি। হেঁটে ক্যাসিনোতে যেতে কষ্ট হত, ক্লান্ত হয়ে পড়তেন স্লট মেশিনের লিভার টানতে গিয়ে।

তা হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন বটে, সৃজনশীল লোকেরা জুয়ো খেলতে পছন্দ করেন। আর আমরা তো বলিউডের তরফেই জেনেছি, জিন্দগি এক জুয়া।

এক দুই তিন

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী ছিল ১৯৬১ সালে। শ্রদ্ধা ও কর্মকৃতি নিবেদনের হৈহল্লা সারা বাংলা জুড়ে।

সত্যজিৎও যোগ দিলেন তাতে সাগ্রহে, সানন্দে। কেন্দ্র সরকারের অনুরোধে তিনি বানিয়ে ফেললেন রবীন্দ্রনাথের ওপর তথ্যচিত্র, এক ঘণ্টার, যেটা নিয়ে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন তিনি ওটা বানালে অন্যরকম করে বানাতেন, ওটায় বেশ কিছু ত্রুটি আছে তবে তারপরেও তিনি ছবিটা উত্তমাঙ্গের মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ডাকটিকিটের নকশাও করেন তিনি।

এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ থেকে তিনটি ছোটোগল্প নিয়ে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন তিন কন্যা, সেও সেই ১৯৬১ সালেই। এন্ড্রু রবিনসন বলেছেন, যদি সত্যজিতের ছবি কেউ না-দেখে থাকেন তবে প্রথমবার দেখার জন্যে তিনি এই ছবিটার কথাই বলবেন।

তিন কন্যা নামে ছবি তিনটি একসাথে দেখানো হত, ধারাবাহিকতা ছিল পোস্টমাস্টার, মণিহারা, ও সমাপ্তি, এরকমভাবে। মূল গল্পের নাম তিনি পাল্টাননি। সত্যজিৎ মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রতিটা ছবিই একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির কাজ করিয়ে নিয়েছে। তাঁর প্রথম ছবি থেকেই সুচিরসঙ্গী সুব্রত মিত্র চোখের সমস্যার কারণে ছিলেন না সেবার। ক্যামেরার কাজ করেন সৌমেন্দু মিত্র, যিনি পরেও থাকবেন সত্যজিতের নানান ছবিতে।

মজার ব্যাপার হলো, বিদেশে ছবিগুলো দুই কন্যা বা টু ডটারস নামে পরিচিত। মণিহারা ছবিটার সাবটাইটেল যথাসময়ে করা যায়নি বলে সেটা আর পাঠানো হয়নি। সত্যজিতের একমাত্র ভৌতিক ছবি দেখা থেকে, তাই, ভিনদেশি দর্শকেরা অন্তত সাময়িকভাবে বঞ্চিত রয়ে গেলেন।

সম্পাদন, সংশোধন-এক

সত্যজিৎ ছিলেন যাঁকে বলে auteur পরিচালক। তিনি চলচ্চিত্রের অনেকগুলো দিকই একা হাতে সামলাতেন যেগুলো উন্নত জগতে একেকজন বিশেষজ্ঞের হাতে থাকে, যেমন: চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা, পোশাকসজ্জা এসব।

তবে এও ঠিক যে তাঁর দলে তিনি বেশ কজন চমৎকার দক্ষ লোক পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর কল্পনা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করেন।

তেমনই একজন হলেন দুলাল দত্ত, তাঁর সম্পাদক। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী (১৯৫৫) থেকে তিনি সত্যজিতের সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘদিন।

প্রথম ছবি পথের পাঁচালী বিদেশে যাবে, হাতে সময় সামান্যই। সত্যজিৎ এই তথ্য দুলালবাবুকে জানানোর পর তিনি একটা থলেতে করে টাওয়েল, তেল, মাজন, ব্রাশ, সাবান ইত্যাদি পুরে চলে এলেন ল্যাবে, কারণ রাতদিন ওখানেই থাকতে হবে। ব্যাপারটা চমকে দিয়েছিল পরিচালককেও, কারণ এই ঘটনা অদৃষ্টপূর্ব।

তো সেই সময়ের একাধিক ঘটনার ভেতর একটা শোনা যাক স্বয়ং দুলালবাবুর কথাতেই: 'ছবিতে শেষের দিকে একটা সাপের দৃশ্য আছে, মনে আছে? খুব বিখ্যাত দৃশ্য। সেটা এডিট করতে আমাদের প্রায় একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। সাপের শটটা সুব্রতবাবু স্টপ গেটের মতো করে নিয়েছিলেন। মানে সাপ চলছে, ক্যামেরা চলছে, যেই সাপ থামছে অমনি ক্যামেরাও বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু ক্যামেরা জায়গা পাল্টাচ্ছে না। এডিটিং-এর সময় আমার অ্যাসিস্টান্টের নেগেটিভ কাটতে একটু গোলমাল হয়ে যাওয়ায় একটা টুকরো হারিয়ে গিয়েছিল। ওই টুকরো না থাকলে সাপের smooth যাওয়াটা বোঝা যাবে না। পাহাড় প্রমাণ কাটা নেগেটিভের টুকরোর ভেতর থেকে ওই ছোট্ট টুকরোটা খুঁজতেই লেগে গেল একটা পুরো দিন। ওই সময় আমাদের একটা দিন নষ্ট হওয়ায় খুব ক্ষতি হয়েছিল। এমনও হয়েছে আমি মানিকদার পা ধরে